বুদ্ধিমতী দাদাই: জীবনপথে দীপ্ত আলো

একজন মুসলিম নারীর আত্মজীবনী, সংগ্রাম, সেবা ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া উপদেশ

মিসেস মাহবুবা হাসিম (লিলি)

সম্পাদনা: প্রফেসর মুহাম্মদ হাসিম উদ্দীন

ইলাননূর পাবলিকেশন

বুদ্ধিমতী দাদাই: জীবনপথে দীপ্ত আলো

একজন মুসলিম নারীর আত্মজীবনী, সংগ্রাম, সেবা ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া উপদেশ

সর্বস্বত

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা: শেখ নাসিম উদ্দিন

প্রথম প্রকাশকাল

নভেম্বর, ২০২৫

ISBN: 978-984-99357-5-9

মূল্য: ২২০ টাকা মাত্র।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট-মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

ইলাননূর পাবলিকেশন
দোকান নং ১২০, ৩৭ গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮০ ১৪০৭ ০৭০২৬৬-৬৯
ওয়েব: www.ilannoor.com; ইমেইল: publication.ilannoor@gmail.com

প্রকাশকের কথা

"বুদ্ধিমতী দাদাই: জীবনপথে দীপ্ত আলো"—শুধু একটি আত্মজীবনী নয়; এটি একটি নারীর নীরব সংগ্রাম, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও সেবায় গড়া এক দীর্ঘ যাত্রার অমূল্য দলিল। এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা দেখি, কীভাবে একজন মুসলিম নারী নিজের সততা, কল্যাণচিন্তা, পরিবারপ্রেম এবং আল্লাহর উপর অটল ভরসা নিয়ে জীবনের প্রতিটি বাঁক অতিক্রম করেছেন।

এই বইটি লেখা হয়েছে তাঁর নাতি-নাতনিদের জন্য, তবে এটি আসলে আমাদের সবার জন্য। কারণ এই গল্প কেবল একজন মানুষের নয়—এটি হাজারো মায়ের গল্প, হাজারো নারীর দৃঢ়তার প্রতিচ্ছবি। যেখানে শৈশবের দুষ্টুমি মিলেমিশে আছে কৈশোরের স্বপ্নের সঙ্গে; যেখানে বৈবাহিক জীবনের কঠিন বাস্তবতার ভেতর লুকিয়ে আছে অবিচল ধৈর্য; যেখানে সংসারের ব্যস্ততায়ও হারিয়ে যায়নি শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার নিষ্ঠা; আর যেখানে জীবনভর সেবা ও ভালোবাসা একসময়ে 'মাদার তেরেসা' নামেও সম্মানিত হয়ে ওঠে।

বর্তমান সময়ের দ্রুতগতির জীবনে এই বই পাঠককে ফিরিয়ে নিয়ে যায় মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ ও আত্মিক শান্তির বুকে—যেখানে পরিবারের বন্ধন, মানুষের প্রতি সদাচার, আর আল্লাহর দেয়া পরীক্ষায় ধৈর্যই সবচেয়ে বড় সম্পদ।

একজন দাদির কোমল ভাষায় লেখা এই স্মৃতিকথা নতুন প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেয়— "বাহ্যিক সাফল্যের চেয়েও চরিত্র, বিশ্বাস ও মানবিকতার আলোকই একজন মানুষকে সত্যিকার অর্থে মহান করে তোলে।"

আমরা বিশ্বাস করি, যারা এই বই পড়বেন, তাঁরা নিজেদের জীবনেও আলো খুঁজে পেতে অনুপ্রাণিত হবেন। এই গ্রন্থ আমাদের প্রকাশনার জন্য একটি গর্বের প্রকাশ;

কারণ আমরা জানি—এটি শুধু একটি বই নয়, একটি পরিবারের উত্তরাধিকার, একটি প্রজন্মের স্মৃতি, আর আগামী দিনের জন্য রেখে যাওয়া এক অমূল্য দিকনির্দেশনা।

আল্লাহ এই প্রয়াস কবুল করুন, এবং এই বই পাঠকের হৃদয়ে আলো ছড়িয়ে দিক।

— **প্রকাশক**

মেজর এ কে এম আহসান হাবিব, জি+ (অব.)

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ৩

ভূমিকা ৯

জন্ম ও পিতৃ-মাতৃ পরিচয় ১০

অধ্যায় ১ : ছোট্ট লিলি – দুষ্টুমি আর বুদ্ধির ঝিলিক ১২

অস্থিরমতি, চটপটে ও দুরন্ত ১২

বুবু আমার কোলবালিশ ১৩

দুষ্টুমি আর শাস্তি ১৩

ভূতের উপর আক্রমণ! ১৪

খেলাধুলা মানেই প্রথম পুরস্কার! ১৫

কবিতার মঞ্চে লিলি ১৫

মহানন্দা নদীর ভয়াল স্মৃতি ১৬

অধ্যায় ২ : আদরের মেয়ে থেকে সাহসী স্ত্রী ১৮

মায়ের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ১৮

তোমাদের দাদাভাইয়ের সাথে পরিচয় ও বিয়ে ১৮

নতুন সংসারে সংগ্রাম ও শাশুড়ীর মন জয় ১৯

কথার পিছনে ভাবনা ২০

অধ্যায় ৩ : শিক্ষার জন্য সংগ্রাম, সংসারের ছায়া ২১

বিয়ের পরের বাস্তবতা ২১

লুকিয়ে পড়াশোনা, প্রকাশ্যে ত্যাগ ২২

পড়াশোনার উদ্যম গড়ালো বিচার সালিশে ২২

বুদ্ধিমতী দাদাই — একটি গল্প ২৩

কথার পিছনে ভাবনা ২৫

অধ্যায় ৪ : নতুন শহরে, নতুন জীবন ২৬

পড়াশোনার জন্য শহরে গমন ২৬

এক ভুল, এক বাধা ২৭

গোপনে স্বপ্নের পাঠ ২৭

থেমে যাওয়া অধ্যায় ২৭

অধ্যায় ৫ : গ্রামে ফিরে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা.........................২৮

"হাশিম তো বৌয়ের হাতে সংসার ফেলে গেছে!" ২৮

'বীরের বেটি' নানু ২৯

কথার পিছনে ভাবনা ৩০

অধ্যায় ৬ : পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশের খোঁজে ৩১

গ্রামীন জীবন ও সন্তানদের প্রতিপালন ৩১

পরিবেশ পাল্টানোর সিদ্ধান্ত ৩১

ক্যাডেট কলেজে নতুন সূচনা ৩২

অধ্যায় ৭ : শিক্ষা-সংস্কৃতির ছায়ায় বড় হওয়া ৩৩

জীবনের শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ ৩৩

একটি মায়ের শিক্ষকতায় বেড়ে ওঠা ৩৩

মূল্যবোধ ও আদর্শে গড়ে ওঠা ৩৪

কথার পিছনে ভাবনা ৩৪

অধ্যায় ৮ : ক্যাডেট কলেজ জীবনের উজ্জ্বল দিনগুলি ৩৫

ক্যাম্পাসে তাঁর ডাকনাম হয়ে গেল 'মাদার তেরেসা' ৩৫

নানু : দি সেক্রেটারি অফ লেডিস ক্লাব ৩৬

সেলাই করা যেন তাঁর নেশা ৩৬

প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ ও প্রশংসা ৩৭

রংপুর ক্যাডেট কলেজে সুতা খেলা ৩৭

মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে উল্টো হাঁটা ৩৮

ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজে মিউজিক্যাল পিলো খেলা ৩৮

একটি কথা, একটি অনুপ্রেরণা ৩৮

বাগান করা ও একসাথে দুই ফসল ফলানোর বুদ্ধি ৩৮

কথার পিছনে ভাবনা ৩৯

সন্তানদের সাফল্য ৪০

একজন মা-কে নিবেদিত একটি কবিতা ৪১

হাসিম ভাবি ৪১

বিদায়বেলায় বিস্ময় ৪২

অধ্যায় ৯ : অবসরের পর জীবনের শান্ত ছায়া ও পারিবারিক সেবা ৪৪

মাহবুবা মঞ্জিলের স্বপ্ন ও বাস্তবতা ৪৪

ছাদের বাগানে প্রকৃতির স্পর্শ ৪৪

অবসরেও ক্যাম্পাসের ছায়ায় ৪৬

কথার পিছনে ভাবনা ৪৬

আম্মার বায়না ও কবিতার গল্প ৪৬

গাজীপুরে যাই ৪৭

অধ্যায় ১০ : জীবনের উপসংহার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি উপদেশ... ৫০

মা এবং শাশুড়ি মার অসিয়ত : আমাদের কাফন দাফন তুমিই করাবে ৫০

পরও যেন আপন ৫১

একজন মুসলিম নারীর আত্মপরিচয় ৫১

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি কিছু কথা ৫২

আশাবাদের শক্তি ও জীবনের আলোকবর্তিকা ৫৩

আশাবাদের শক্তি ও জীবনের আলোকবর্তিকা ৫৫

কথার পিছনে ভাবনা ৫৬

প্রিয় নাতি-নাতনিদের জন্য একটি চিঠি ৫৬

একটি দোয়া ৫৭

শেষকথা ৫৮

✍️ ভূমিকা

এই গ্রন্থটি কোনো কল্পনার গাঁথা নয়, বরং একজন নারীর জীবনের বাস্তব যাত্রার নিখুঁত অনুপুঙ্খ বিবরণ। এটি একজন মেয়ে, মা, স্ত্রী, শিক্ষিকা, দায়িত্বশীল প্রতিবেশি, এবং সর্বোপরি একজন মুসলিম নারীর আত্মজীবনী—যিনি প্রতিটি অবস্থানে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠা, বুদ্ধিমত্তা ও ভালোবাসা দিয়ে।

এই বই আমার শৈশবের দুষ্টুমি থেকে শুরু করে বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত, সংসারের চ্যালেঞ্জ থেকে ক্যাডেট কলেজ ক্যাম্পাসে সমাজসেবা, এবং ছাদবাগান থেকে শেষ বয়সের ফিরে দেখা অনুভব, অনুভূতি ও প্রার্থনা পর্যন্ত পথচলার গল্প । এটি কেবল একটি আত্মজীবনী নয়, এটি একটি সময়ের দলিল, একটি মূল্যবোধের সংরক্ষণ, এবং একটি পরিবারের গল্প।

এই আত্মজীবনী প্রজন্মান্তরে সন্তানদের জন্য হবে অনুপ্রেরণার বাতিঘর—যেখানে তাঁরা তাঁদের শিকড়কে চিনবে, দায়িত্ববোধকে শিখবে, এবং বিশ্বাস রাখবে যে একজন মুসলিম নারী—চাইলেই, করলেই পারে।

জীবনের প্রতিটি ধাপ—শৈশব, যৌবন, বৈবাহিক জীবন, মাতৃত্ব, সামাজিক সেবা ও অবসর—সবই ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একেকটি দায়িত্ব, আর আমার জন্য একেকটি সুযোগ। আমি চেষ্টা করেছি প্রতিটি দায়িত্ব মন থেকে পালন করতে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে। এখন যখন পেছনে ফিরে তাকাই, তখন মনে হয়, "আলহামদুলিল্লাহ, আমি চেষ্টা করেছি আমার দায়িত্ব পালনে গাফিল না হতে।"

আজ আমি যেখানেই আছি, এটি এককভাবে আমার কোনো অর্জন নয়, বরং এটি আমার পরিবারের, আমার শিক্ষকদের, আমার স্বামী এবং সন্তানদের সম্মিলিত ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সহযাত্রার ফসল।

জন্ম ও পিতৃ-মাতৃ পরিচয়

আমি ১৯৫৩ সালের ৬ এপ্রিল চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার এক শিক্ষিত গৃহস্থ পরিবারে জন্মেছিলাম। আমার বাবা, মোহাম্মদ রমজান আলী বিশ্বাস, তখন তানোর থানার কৃষি অফিসার। আর আমার মা, মোসাম্মাত সামসুন নাহার, ছিলেন লালপুর প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। আমার চাচারাও সবাই শিক্ষিত ছিলেন।

বাবার পাশাপাশি আমার জীবনের অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিলেন আমার মা—তোমাদের মিষ্টি মা! তিনি ছিলেন এক আলোকিত নারীর প্রতিচ্ছবি—ব্রিটিশ আমলের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ। কিন্তু তাঁর এই শিক্ষার পেছনে ছিল অসীম ত্যাগ আর অক্লান্ত সংগ্রাম।

গ্রামে তখন মেয়েদের স্কুলে যাওয়া খুব বিরল ঘটনা, বিশেষত উচ্চশিক্ষা তো স্বপ্নের মতো। স্কুল অনেক দূরে হওয়ায় মিস্টি মা-কে আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়তে হতো। ছোটবেলায় তাঁকে স্কুলে অভ্যস্ত করানোর জন্য আমার নানা—মোহাম্মদ আব্বাস রহিম সরদার—অবিশ্বাস্য ধৈর্য আর মমতা দেখিয়েছিলেন। প্রতিদিন রাত তিনটায় ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে তুলে গরুর গাড়িতে বসিয়ে রওনা হতেন, সকাল হওয়ার আগেই পৌঁছে যেতেন স্কুলের কাছে।

বাবা আর মেয়ে— দু'জনের জন্যই নাস্তা বেঁধে দিতেন আমার নানী। স্কুলে গিয়ে মিষ্টি মা কান্নাকাটি করলে আমার নানা তাঁর পাশে বসে ক্লাস করতেন। সপ্তাহ শেষে বৃহস্পতিবারে বাড়ি ফিরতেন, আর রবিবার সকালে আবার সেই দীর্ঘ যাত্রা শুরু হতো। ধীরে ধীরে মিষ্টি মা স্কুলের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন।

প্রাথমিক শেষ করার পর, নানা সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন— মাকে কলকাতায় পাঠাবেন উচ্চশিক্ষার জন্য। কিন্তু এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। গ্রামবাসী ও আত্মীয়রা নানাকে একঘরে করে দিয়েছিল, কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু নানা হার মানেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন—একজন মেয়েকে শিক্ষিত করা মানে পুরো প্রজন্মকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া।

আমার মায়ের সেই আত্মত্যাগ তাঁকে আলোকিত নারীতে পরিণত করেছে। তিনি শুধু নিজের জীবন নয়, তাঁর সন্তানদের জীবনও আলোকিত করেছেন। আমি তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়, আর গর্বের সাথে বলি—আমাদের জীবনের আলো এসেছে আমাদের মায়ের সংগ্রাম ও শিক্ষার হাত ধরে।

অধ্যায় ১ : ছোট্ট লিলি – দুষ্টুমি আর বুদ্ধির ঝিলিক

অস্থিরমতি, চটপটে ও দুরন্ত

তোমাদের দাদাই, মানে আমি, ছোটবেলায় মোটেও শান্তশিষ্ট ছিলাম না। অস্থিরমতি, চটপটে আর একটু বেশি দুষ্টু বললেই ঠিক হয়! আমার মাথায় যেসব দুষ্টুমির বুদ্ধি আসতো, তা কেউ আগে ভাবত না, কেউ করতে সাহসও করত না।

আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল একটা পুকুর। মাছ ধরার খুব শখ ছিল আমার। কিন্তু একদিন মাছ ধরতে গিয়ে যা করলাম, সেটা আজও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। আমি কাদায় হাত ডুবিয়ে মাছ ধরছিলাম, হঠাৎ একটা নড়াচড়া টের পেয়ে তাড়াতাড়ি তুলে দেখি—একটা সাপ! সাপটা আমার হাত পেঁচিয়ে ধরে কামড় দিয়েছিল। তখনকার ভয় আর ব্যথা একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বুকের ভেতর। কিন্তু কাঁদিনি। কারণ জানতাম, কাঁদলে পুকুরে যাওয়া বন্ধ করে দেবে সবাই। সেই বয়সেই শিখেছিলাম, সাহস মানে ভয় না পাওয়া নয়—ভয়ের মুখে দাঁড়িয়েও শান্ত থাকা। সেদিন মনে হয়েছিল, হাতটাই বুঝি কেটে ফেলতে হবে! এখন ভাবলে হাসি পায়, কিন্তু তখন সেই চুপচাপ সহ্য করাটাই ছিল আমার সাহসের শুরু।

আরেকবার আমার গায়ে বড় একটা ফোড়া উঠেছিল। ব্যথায় সারারাত ঘুমাতে পারিনি। কিন্তু কাউকে ডাকার সাহস হয়নি। তার বদলে আমি কী করলাম জানো? মাঝরাতে উঠে আম কুড়াতে চলে গেলাম! যেন আম কুড়িয়ে ব্যথা ভুলে থাকতে পারি।

আমার ভাইবোনদের সঙ্গে দুষ্টুমি ছিল নিত্যদিনের কাজ। কিন্তু একটা জিনিস সবসময় মনে রাখতাম—**বাবা-মায়ের কথা শুনতাম ভীষণভাবে**। যত দুষ্টুমিই করতাম না কেন, আমি ছিলাম তাঁদের গর্বের মেয়ে। পড়াশোনায় ভালো, কাজেকর্মে মনোযোগী আর সবার জন্য সহানুভূতিশীল।

ছোট থেকেই আমার ভেতরে একটা জিনিস গেঁথে গিয়েছিল—**জীবন মানেই শেখা আর সেবার হাত বাড়ানো**। সবার পাশে থাকা আর পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই ছিল আমার আনন্দ।

👧 বুবু আমার কোলবালিশ

আমার বড় বোন, বুবু, ছিল আমার পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের মানুষ। আমি সবসময় ওর গায়ে পা তুলে ঘুমাতাম—একদম গুটিশুটি মেরে। ও বারবার সরিয়ে দিত, আমি বারবার রেখে দিতাম। ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি এক নির্ভরতার সম্পর্ক ছিল আমাদের।

একদিন বুবু বিরক্ত হয়ে আমার পায়ে এমন একটা চিমটি কাটল, যে ছালই উঠে গেল! সেই সময় আমি স্বপ্ন দেখছিলাম—আমি বরই গাছে উঠে বরই পাড়ছি, হঠাৎ কাঁটা লেগে পায়ের ছাল উঠে গেছে। সকালে উঠে দেখি, স্বপ্নটাই যেন বাস্তবে ঘটে গেছে। আমি ছুটে গিয়ে আম্মাকে দেখাতে পাশে দাঁড়িয়ে বুবু হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, "তুই তো শুধুই পা তুলিস, এবার তো আমি একেবারে ছাল তুলে দিলাম!"

সেই গল্পে ব্যথার চেয়ে বেশি ছিল হাসির রেশ, আর ছিল এক শৈশবের নির্ভেজাল ভালোবাসা।

🐍 দুষ্টুমি আর শাস্তি

আমার দুষ্টুমিগুলো ছিল যেমন হঠাৎ মাথায় আসা, তেমনি অভিনব! একদিন উঠানে একটা কেঁচো দেখি। হঠাৎ কী মনে হলো, সেটা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম বুবুর গায়ে! বেচারি চিৎকার করে এমন ভয় পেল, যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, “এ তো কেঁচো, ভয় কিসের!” পরে জানতে পারলাম, তখন বুবু প্রেগন্যান্ট ছিলেন।

আম্মা যখন শুনলেন, আর রক্ষা ছিল না। ঝাঁটার বাড়ি খেতে খেতে বুঝে গেলাম, সব মজা সবার জন্য নয়, সময় বুঝে কাজ করা শেখাটাও বড় শিক্ষা।

আরেকবার শীতের রাত। আমি বাতি হাতে দাঁড়িয়ে, কাছেই আলনায় ঝোলানো পাতলা শাড়ি। আমার দুষ্ট মনের ভাবনা—বাতি দিলে আগুন ধরে কি না দেখি। দেখতেই দেখি সত্যি আগুন ধরে গেছে! আমি চমকে গিয়ে বলে উঠি, “দেখে নাওরে, দেখে নাও, মজার খেলা দেখে নাও!” বাতি- মম্বাতি/হারিকেন? (আগুনের ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য)

সেই 'মজা'র খেলা কিন্তু আব্বার হাতে আমার জন্য যে খেলায় পরিণত হলো, সেটা ছিল একেবারে বাস্তব! বুঝলাম, আগুন যেমন আলো দেয়, তেমনি ভুল করলে পোড়াতেও জানে।

ভূতের উপর আক্রমণ!

আমাদের দাদার ছিল বিশাল আমবাগান। আমের মৌসুমে সন্ধ্যা-রাত জুড়ে উনি আমবাগান পাহারা দিতেন, সন্ধ্যা হলে হারিকেনের আলোতে আমরা ভাইবোনরা সবাই মিলে বসে দাদার কাছে পড়তাম। পড়া শেষে বাড়ী ফেরার সময় আমি সবসময় সামনে থাকতাম। দুষ্টুমিতে যেমন সেরা ছিলাম তেমনই সাহসও আমার বেশি ছিল- সবার কাছে বড়াই করতাম সাহস নিয়ে। একদিন এক চাচাতো ভাই সাহস পরীক্ষা করতে চাইলেন।

চারিদিকে গাছপালা, তার মাঝখান দিয়ে অন্ধকার পথে বাতি হাতে প্রতিনিধি আমি- হঠাৎ করে সাদা চাদরের এক ভূত লাফ দিয়ে এসে পথের মাঝখানে ধপ করে বসে পড়ল! পেছনে ভাইবোনরা সবাই ভূত – ভূত বলে চিৎকার করে ছুটাছুটি লাগিয়ে দিল। আর আমি? হাতে ছিল কাঠের ফ্রেমের স্লেট, সেটা দিয়ে গায়ের সমস্ত জোর এক করে ভূতকে মার লাগিয়ে দিলাম! মেরেই চলেছি, চাচাতো ভাই তখন বাধ্য হয়ে চাদর সরিয়ে বলল, “এই তুই আমাকে পিটাচ্ছিস কেন?” আমি বললাম, “আপনাকেতো আমি পেটাইনি, ভূতকে পেটাইছি!”

সেই ঘটনা এতবার বলা হয়েছে আমাদের পরিবারে, যেন একটা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। কে বলেছে সাহস কেবল ছেলেদের জন্য? সাহস হল হৃদয়ের জিনিস—যে চায়, সে পায়।

খেলাধুলা মানেই প্রথম পুরস্কার!

শুধু পড়াশোনা নয়, খেলাধুলাতেও আমি ছিলাম তুখোড়। সুই-সুতা দৌড়, দড়ি লাফ, চামচ-মার্বেল, চেয়ার দখল খেলা—যেটাতেই নাম দিতাম, তাতেই প্রথম পুরস্কার পেতাম।

একবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমার একের পর এক জয় দেখে পরেরবার থেকে শিক্ষকরা নিয়ম করলেন, "এবার তুমি মাত্র দুইটি খেলায় অংশ নিতে পারবে।" শুনে মন খারাপ হয়েছিল, কিন্তু কি আর করা! দুটো খেলাতেই অংশগ্রহণ করে প্রথম পুরষ্কার জিতে নিলাম।

মনে রাখবে, একেকজনকে আল্লাহ একেক ধরনের প্রতিভা দিয়েছেন। নিজের প্রতিভা খুজে বের করবে, তাতে সময় দিবে, কিন্তু তা ছাড়াও- যা কিছুতে তুমি অংশগ্রহণ করছ, সব সময় নিজের সর্ব চণ্ড চেষ্টা করবে।

কবিতার মঞ্চে লিলি

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন। স্কুলে কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হচ্ছে। নির্বাচিত হলাম। কবিতাটি ছিল কাজী নজরুল ইসলামের 'খুকি ও কাঠবিড়ালি'। আমি শুধু কণ্ঠে নয়, চোখেমুখে, হাত-পায়ে—সারা শরীরে ফুটিয়ে তুলেছিলাম কবিতার চিত্র। যেন শ্রোতার সামনে সত্যিই এক খুকি আর এক কাঠবিড়ালির কল্পজগৎ দাঁড়িয়ে আছে।

শেষে যখন বলি:

তুমি মর! তুমি কচু খাও!

—তখন হাসির রোল পড়ে যায় পুরো হলে। আমার দুষ্টু হাসি, সাহসী চোখ আর দৃঢ় কণ্ঠে সে কথাগুলো যেন কবিতার গণ্ডি পেরিয়ে যায়। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে বাড়ি ফিরি। ট্রফিটা ড্রয়িংরুমে তুলে রাখি, যেন প্রতিদিন নিজেকে মনে করিয়ে দিতে পারি—ভয় না পেলে মঞ্চে ওঠা যায়, আর হৃদয় দিয়ে বললে—সবাই শোনে।

মহানন্দা নদীর ভয়াল স্মৃতি

আমি তখন ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। এক বৈশাখের দিনে মহানন্দা নদীতে গোসল করতে গিয়ে এক শ্বাসরুদ্ধকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমাদের প্রতিবেশী দারোগা নানী—যাঁর স্বামী ছিলেন পুলিশ দারোগা—তিনি চরের দিকে তাঁর বাঙ্গির ক্ষেতে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, যাব কিনা। আমার ছোট বোন শিউলি তখন একেবারে ছোট; তারও জেদ, সেও যাবে।

আমি শিউলিকে পিঠে নিয়ে দারোগা নানীর সাথে নদী পার হতে শুরু করি। নদী তখন অনেকটা শুকিয়ে গেলেও স্রোত ছিল প্রবল। ধীরে ধীরে নদীর পানি বাড়তে থাকে, আর আমি গলা পর্যন্ত ডুবে যাই। শিউলি তখন আমার ঘাড়ের উপর উঠে বসে। স্রোত আমাকে নানীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে টেনে নিয়ে যায়। নানী বারবার তাঁর শাড়ির আঁচল বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু নাগাল আমি নাগাল পাচ্ছিলাম না।

আমি পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে শিউলিকে উঁচু করে রাখার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু নিজে বারবার ডুবে যাচ্ছিলাম। শিউলির কান্না আর চিৎকারে অবশেষে আশপাশের জেলেরা আমাদের দেখতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে এবং নৌকায় তুলে আমাদের প্রাণ রক্ষা করে।

বাড়ি ফিরে আমি বলেছিলাম, "শিউলি, নদীর পানি খেয়ে আমার পেট ভরে গেছে। দুপুরে ভাত খেতে পারব না। ডাকাডাকি করবি না।" প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই।

তিন-চার দিন পরে আমার মা জানতে পারেন এই ভয়াবহ ঘটনার কথা, যখন দারোগা নানী বলেছিলেন, "তোর মেয়েরা তো সেদিন ডুবে যাচ্ছিল!"

এই ঘটনা আজও আমার স্মৃতিতে রোমাঞ্চ আর শোকের এক মিশ্র অনুভূতি হয়ে জেগে আছে। মহানন্দার স্রোতের সাথে সেই দিনের জীবন-মৃত্যুর লড়াই যেন আমার শৈশবের সাহসিকতার এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়।

এই ছিল তোমাদের দাদাইয়ের ছোটবেলার গল্প—দুষ্ট, প্রাণবন্ত, আর প্রখর বুদ্ধিতে ভরা। এই মেয়েটাই পরে জীবনের প্রতিটা স্তরে পরিণত হয় সাহসী এক মহীয়সী নারীতে। কীভাবে? তা জানতে হলে পড়তে হবে পরের অধ্যায়...